# কবিতার অন্যকোনখানে

## উত্তল আয়নায় আত্মপ্রতিকৃতি

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

নিজেদের ঈশ্বরের পরিচয় দেওয়া যায়না। তাই জন অ্যাশবেরীর পরিচয় দেওয়াটা আমার পক্ষে খুব কঠিন। পাহাড়ী বাঁকের পাশে যেমন খরস্রোতাটির একাংশ আচমকা চোখে পড়ে, এক ঝাঁক মাছ সেই ধারায় অতিদ্রুত বেঁকে চলে যায়, তেমনি অজস্র কথার কুহক আমার মনের মধ্যে ঘুরতে থাকে। খুব সোজাকথায় বলে দেওয়া ভালো, যে এক তরুণ পরীক্ষাকবি হিসেবে আমি জন অ্যাশবেরীকে ধ্রুবতারা ভাবতে বাধ্য হই। এটা কিছু নতুন কথা নয়। এই মুহূর্তে পৃথিবীর বহু দেশের বহু তরুণ কবি এইভাবেই অ্যাশবেরীর কবিতাকে ভাবেন। এই মুহুর্তে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে জন অ্যাশবেরী সর্বজনশ্রদ্ধেয়, তরুণ কবিদের উপাস্য। যতরকমের পুরস্কার পাওয়া সম্ভব সব পেয়েছেন। যদিও জনজীবন থেকে নিস্পৃহ দূরত্বে থাকেন। ফরাসী সরকারের থেকে পেয়েছেন - লেজঁ দ্যনার (যে পুরস্কার সত্যজিৎ রায় পান)। একইসঙ্গে প্রায় সকলের চোখেই অ্যাশবেরী এক 'দুরুহ' কবি। কবিতা নিয়ে দীর্ঘ ৫০ বছর এমন চূড়ান্ত রকমের পরীক্ষা অন্তত আর কোন বহুপুরস্কৃত, বিখ্যাত কবি করেননি। পশ্চিমী উত্তরাধুনিক কবিতালোচকদের অনেকেই অ্যাশবেরীকে এই যুগে সর্বোচ্চ গুরুত্বের কবি মনে করেন। এক সংস্থার মাধ্যমে জানলাম পৃথিবীতে জীবিত কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অ্যাকাডেমিক গবেষণা হয়েছে জন অ্যাশবেরীকে নিয়ে।

জন অ্যাশবেরীর সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ হয় ২০০৫ সালের বসন্তে। আশীর দশকের এক উজ্জ্বল মার্কিণ কবি পিটার গিজ্‌সি যোগাযোগটা ঘটিয়ে দেন। দূরভাষে সেদিন জনকে বলি ওঁর সর্বোচ্চ আলোচিত কবিতা (ও একই নামের কাব্যগ্রন্থ যা ১৯৭৭ সালে পুলিৎজার পুরস্কার পায়) 'উত্তল আয়নায় আত্মপ্রতিকৃতি' (Self-Portrait in a Convex Mirror) পড়ার চেষ্টা করছি। জানিনা তার অনুবাদ সম্ভব কিনা। জন প্রত্যুত্তরে হেসে বলেছিলেন - 'দারুণ শক্ত লেখা মনে হচ্ছে , তাই তো ? ভয়ংকর জটিল একটা কবিতা লিখে ফেলেছিলাম তখন।'

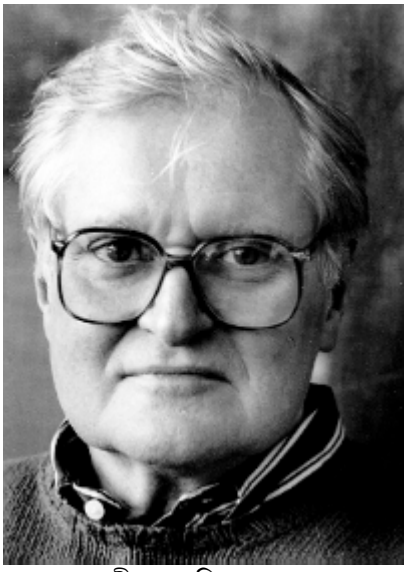

জন অ্যাশবেরী, সম্প্রতি

ঐ আপাত-সুবিনয়ী বাক্যের মধ্যে যে কি কঠিন সত্য লুকিয়ে ছিল সেটা ক্রমশ আমার কাছে ধরা পড়তে থাকে। কাঠামোগত ও লিখনশৈলিগত নানা পরীক্ষা ঐ কবিতায়। প্রিন্ট করার পর লক্ষ্য করি ফুল স্কেপ কাগজে তের পাতা দীর্ঘ ঐ কবিতা। কবিতাটির এই দৈর্ঘ্য, যুক্তিবিযুক্তির বুনন সম্ভবত অধিকাংশ বাঙালী তরুণ কবির কাছে অধরা থেকে যাবে। অ্যাশবেরীর কবিতার ভাষা অনেক সময়েই কথ্য, অতিমৌখিক। সেটাও হয়তো অজকের বাঙালী কবিদের কাছে সেকেলে ঠেকতে পারে। আমার প্রথম পাঠ শেষ হয়নি, এমনকি মাঝমাঠেও পৌঁছয়নি। তার আগেই আমি ক্লান্ত বোধ করতে শুরু করি। কবিতাটি অনুবাদ করার বাসনা কমে যেতে থাকে। এটা স্পষ্ট হতে থাকে নিজের কাছে যে এই কবিতা অনুবাদ করার যোগ্যতাও আমার নেই। কোন কোন জিনিষ নিয়ে বেশী মাথা ঘামাতে নেই, গড় করে তাকে তুলে রাখতে হয়। 'উত্তল আয়নায় আত্মপ্রতিকৃতি'-র বেলায় আমার তাই হল।

মার্চ ২০০৬-এ পিটার গিজ্‌সি কবিতা পড়তে এলেন সিনসিন্যাটি শহরে। এক টিউলিপ ভেজানো গুঁড়োবৃষ্টির দুপুরে, বেথ বুকস্টোরের কাফেতে বরফ দেওয়া র‍্যাস্পবেরী-চা নিয়ে পিটারর সঙ্গে বসে আর্ধেক কথা হল অ্যাশবেরীর সম্বন্ধেই। পিটার বললো - 'জানো তো ?

আজ-কাল-পরশু , এই তিনদিন নিউ ইয়র্ক শহরে 'জন অ্যাশবেরী ডে'। ভাবতে পারো ?' বুশ জমানায় কোন 'অরাষ্ট্রীয়' কবির নামে দিনপালন - সত্যিই ভাবা যায় না। সেদিন পিটারকে বললাম আমার ব্যর্থতার কথা। জনের 'উত্তল আয়নায়' নিজেকে দেখতে না পাওয়ার কথা। আমার সুরে নানা হতাশা জড়িয়ে গেল হয়তো। বললাম - 'কি জানো ? আমরা বাংলা ভাষায় এত দীর্ঘ কবিতা হয়তো সারা বছরে দশটা দেখি। তারওপর কবিতাটির বিশিষ্ট নেপথ্য না জেনে (যার সঙ্গে ইউরোপীয় চিত্রকলার ইতিহাসের একখন্ড ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে) এই কথ্যভাষা, পাতার পর পাতা পড়ে যাওয়ার ইচ্ছে বাঙালী পাঠকের আর আছে কিনা সে বিষয়ে আমার প্রগাঢ় সন্দেহ। আমাদের কবিতায় কথ্যভাষা বা মৌখিকভাষা নিয়ে ষাটের দশকে, সত্তরের দশকে প্রচুর লেখালিখি হয়েছে। আজকের পরীক্ষা কবিতার ভাষার মধ্যে তাই এই মৌলগুলি অনুপস্থিত.....ইত্যাদি ইত্যাদি।' পিটার আমার বিবেকে ফটকিরি ঘষে দিয়ে বললো - ' কোর না। যে কবিতা ভালো

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

লাগবেনা সেটা ভুলে যাও। যখন মনে হয় সভাঘরে সবাই হাততালি দিচ্ছে, আসলে অনেকেই কিন্তু দিচ্ছে না তখন। সব সো-কলড্ গ্রেট পোয়্মের ক্ষেত্রেই এটা হয়। এক একজন কবিকে বা মানুষকে স্পর্শ করতে পারেনা।'

এপ্রিল এল। টিউলিপদের বিপন্নতা কেটে গেল। তারা মুখ খুললো, তাদের রূপের কৌটো ফাটলো। নতুন শক্তি সঞ্চয় করে আমি আবার বসি 'উত্তল আয়নায় আত্মপ্রতিকৃতি' নিয়ে। এবং আশ্চর্য হয়ে যাই। প্রথম পাতাতেই বিপ্লব ঘটে যায় আমার কবিতাভাবনায়। প্রথম পাতা পেরোতে না পেরোতেই টের পাই এক অনন্যসাধারণ কবিতার খপ্পরে পড়েছি। কেন এতদিন এমন মনে হয়নি ? নেপথ্যতথ্য জানলে এক একটা অন্ধ কবিতা হঠাৎ চোখ খুলে মেলে দেয়। আমরা চমকে দেখি কি বিশালনয়না সে, এতটাই যে সেই চোখের মণিতে আমরা নিজেদেরও দেখতে পাচ্ছি। 'উত্তল আয়না'র ক্ষেত্রে ঠিক তাই হলো আমার। উত্তল আয়নার সামনে দাঁড়ালে তাই হয়।

ষোড়শ শতকে ইতালীতে চিত্রকর ফ্রান্সেস্কো পারমিজিয়ানিনো (Francesco Parmigianino, 1503-1540) 'উত্তল আয়নায় আত্মপ্রতিকৃতি' নামে একটি বিখ্যাত ছবি আঁকেন। 'লম্বা গলার ম্যাডোনা' তাঁর আর একটি বিখ্যাত ছবি। আকার কে অল্প টেনে হিঁচড়ে, সামন্য দুমড়ে মুচড়ে নতুন আকারে নিয়ে যাবার একটা প্রবণতা পারমিজিয়ানিনোর ছবিতে লক্ষ্য করা যায়। 'উত্তল আয়নায় আত্মপ্রতিকৃতি' ছবি রচনা সম্বন্ধে শিল্প-ঐতিহাসিক জর্জিয়ো ভাসারি লিখেছিলেন - 'Francesco one day set himself to take his own portrait, looking at himself from that purpose in a convex mirror, such as is used by barbers. He began to draw himself as he appeared in the convex glass. He had a ball of wood made at a turner's and divided in half, and on this he set himself to paint all that he saw in the glass. Because the mirror enlarged everything that was near and diminished what was distant, he painted the hand a little large"। এই ছবি উত্তল আয়নার মাধ্যমে একটা নতুন দেখা এগিয়ে দেয় আমাদের দিকে। একটা দর্শন যেখানে আমরা নিজেদের চেয়ে বড় হয়ে উঠছি এবং আমাদের পারিপার্শ্বিক ক্রমাগত ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কনস্যুমারিস্ট সমাজের আমিত্বকে ধরবার একটা নতুন সুযোগ দিয়ে যায় এই 'উত্তল আয়না'। আর জন অ্যাশবেরীর মত কবির জন্য তৈরি করে আরো নানা সম্ভাবনা।

জন অ্যাশবেরী প্রথম ১৯৫৯ সালে, ভিয়েনার যাদুঘরে পারমিজিয়ানিনোর 'উত্তল আয়নায় আত্মপ্রতিকৃতি' ছবিটি দেখেন। ছবিটা ওঁর ভালো লেগেছিলো। ১৪ বছর পরে, ৭৩এর ফেব্রুয়ারীতে প্রভিন্সটাউনে অ্যাশবেরী কাজ করছিলেন কিছুদিন। সেই সময়ে একদিন এক বইয়ের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে লক্ষ্য করেন শোকেসে একটা ছবির বইয়ের মলাটে পারমিজিয়ানিনোর ঐ ছবিটার প্রিন্ট। দুদিন পর বইটা কেনেন অ্যাশবেরী। ছবিটা মুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে একদিন শুরু করেন ঐ একই নামের একটা কবিতা।

*'উত্তল আয়নায় আত্মপ্রতিকৃতি' ফ্রান্সেস্কো পারমিজিয়ানিনোর মূল ছবি। সামনে রাখা হাতটা শরীরের তুলনায় বৃহদাকার হয়ে ধরা পড়েছে আয়নায়। বাঁদিকে ওপরের দিকে দেয়ালের জানলাটা চেপ্টে ছিদ্রাকার।*

পুনর্পাঠে কবিতাটির বহু ঔজ্জ্বল্য ধরা পড়তে থাকে আমার কাছে। কোন কোন জায়গা যে অনুবাদযোগ্য এমনও মনে হতে থাকে। উৎসাহী কবি ও পাঠকদের অনুরোধ করবো মূল কবিতাটি প্রথমে ইংরেজীতেই পড়তে। স্থানাভাবে পূর্ণাঙ্গ কবিতাটি এখানে তোলা গেল না। কয়েক ছত্র , যা কিঞ্চিৎ আত্মবিশ্বাস নিয়ে অনুবাদ করতে পেরেছি, এখানে রাখলাম -

কাব্যাংশ-১

'পোপ ক্লিমেন্ট ও তার ধর্মসভা ছবি দেখে হতভম্ব, এতটাই,
যে , ভাসারির মতে, একটা কমিশন বসাতে চেয়েছিলেন
সফল হয়নি শেষ পর্যন্ত। আত্মাকে থাকতে হবে তার নিজের জায়গাতেই
সে যতই তার ধরফড়ানি হোক, স্কাইলাইটে বৃষ্টিফোঁটার শব্দ হোক বা

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

হেমন্তের পাতা হাওয়ায় আছাড় খাক, মুক্তিকামিতায়, বাইরে
যাবার বাসনায় ; সে যতই হোক, ভেতরেই রয়ে যেতে হবে তাকে
শান্তিপ্রিয় স্বভাবে। নড়াচড়া হবে যৎসামান্য। অন্তত ছবিটা সে কথাই বলছে।'

কাব্যাংশ-২

'ফ্রান্সেস্কো, তোমার হাতটা কি বড়, এই গোলার্ধ ভেঙে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট
আবার সূক্ষ্ম জাল বোনার পক্ষে যেন দৈত্যাকার ; হয়তো তাই বিরত
(বড় হলেও ঠিক মোটা দাগের নয়, যেন একটা সম্পূর্ণ অন্য স্কেলে রাখা,
যেমন সাগরতলে খেলে বেড়ানো এক মস্ত তিমির তুলনায়
কি পুঁচকে জলের ওপর ঐ আমিত্বময় জাহাজ)
চোখ কিন্তু বলবে উপরিতলই সব। আর কিছু নয়।
আর চোখের সামনে যা রয়েছে তা বাদে আর কিছুর অস্তিত্ব থাকতেই
পারেনা। এই ঘরে ছিটেফোঁটা বাড়তি জায়গাও নেই, কেবল দালানটুকু,
জানলা নিয়েও বিশেষ মাথাব্যাথা নেই, ডানদিকে ঐ এক চিলতে ছিদ্রনামক জানলা
বা আয়না, আসলে আবহাওয়া মাপার এক গেজ ভিন্ন কি ! জানেন তো ফরাসীতে
আবহাওয়াকে বলে 'ল্য তাঁ' যা সময়ের পরিবর্ত শব্দ, এবং এসমস্তই বলে দেয়
পরিবর্তন আসলে গোটা ছবিটার একটা টুকরো'

ভোগবাদী সমাজে 'আমি' র সুউচ্চ গুরুত্ব। সেখানে আর সমস্ত পরিপার্শ্বিকতাই গৌণ হয়ে পড়ে ভয়াবহভাবে। সাথে সাথেই আসে বস্তু ও তার মূল্যবোধ ভাবনা। বস্তুর ওপর এসে প'ড়ে থাকে উপরিভগের ধুলো। বা ওপরের পালিশ। বহিরঙ্গের যাবতীয়। বইটি বিবেচিত হয় তার মলাট দেখে। মুখ-বুক দেখে মেয়েটি। ডিগ্রী ও রোজগার দেখে হবু জামাই। এই উপরিতলের পাতলা ও মিথ্যা আচ্ছাদন যে জগৎটা আমাদের দেখায়, কোন একদিন সেটা ভেঙে পড়ে (বা বহু মানুষের ক্ষেত্রে কোনদিনও পড়ে না)। ঠিক তখনি চোখে পড়তে থাকে এতদিনের না-দেখাগুলো।

'উত্তল আয়নায় আত্মপ্রতিকৃতি' যেন জন অ্যাশবেরীর শ্রেষ্ঠ আত্মপক্ষ সমর্থন গ্রন্থ। এটা আমার বারবার মনে হয়েছে। অর্থ-অর্থান্তর, বিষয়-বিষয়ান্তর নিয়ে সারাজীবন অ্যাশবেরী যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার খেলায় মেতেছেন, এই দীর্ঘকবিতার বহু পংক্তি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। যেমন কাব্যাংশ ২-তে জাহাজ ও তিমির কথা এল। এল জানলা ও গেজের কথা। সাগরের উপরিতলে ঐ জাহাজকে আমাদের বিরাট মনে হয়। অথচ সেই সাগরের ভূপৃষ্ঠার কাছাকাছি খেলে বেড়াচ্ছে তার চেয়েও বৃহত্তর তিমিমাছগুলি। আমাদের সব দেখার মতই - ওপর ওপর। গভীরে যা রয়ে গেছে তা অদৃশ্যই থেকে যায়। যেমন জানলা দিয়ে উঁকি মেরে বাইরের আবহাওয়া মাপা হয় বেশিরভাগ সময়। সুতরাং একটা গেজ ছাড়া কি ঐ অলিন্দ ? তার মাধ্যমে কোন গভীর দৃশ্য দেখতে পাইনা আমরা। তদুপরি আমাদের কবিতাপাঠ। 'সারফেস'-এর অর্থটুকুই আমরা খুঁজি বেশিরভাগ সময়ে। একটা দুটো চেনা ছবি, চেনা ভাবনা পেয়ে গেলে, ভাষায় একটা সতেজতা পেয়ে গেলেই হাততালি দিই। কেবল গানে বলি 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি'। আসলে দিই না। জাহাজের চেয়ে বড় তিমি শুনলে অবিশ্বাসে খিক খিক করে হাসি। এইখানেই জন অ্যাশবেরী তাঁর তথাকথিত আভাঁ-গার্দ কবিতাভাবনা (যা আমার ভাবনায় 'পরীক্ষা কবিতা') নিয়ে বুর্জোয়া পাঠকের বুক চিরে দেন। তাঁকে আত্মানুসন্ধানে বাধ্য করেন। এক ঝটকায় টেনে তোলা ছিপে আটকানো অর্থ পেরিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেন হ্রদের গভীরে ঐ হাজারো অধরাদের। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জাহাজ বনাম তিমি ভাবনার ক্ষেত্রে এমনও ভাবা যেতে পারে যে তিমি 'প্রকৃতি' আর জাহাজ 'প্রযুক্তি'। কেউ এমন ভাবলে যে সে ভাবনা ভুল হয়না - এখানেই কবিতা আরো বেশীরকমের সার্থক, আকরে একাধিক ভাবনর ধাতু রেখে দিতে পেরেছে বলে।

এইভাবেই পড়তে পড়তে আর এক জায়গায় এসে চোখ আটকে যায়। এই মুহূর্তে যে কবিতাভাবনা ও বিশ্বাসে জারিত হচ্ছে আমার একান্ত নিজস্ব মনন (এবং আমার মত অন্তত আরো ২/৩ ডজন সমসাময়িক বাঙালী কবির ) অ্যাশবেরীর নীচের পংক্তিগুলিতে যেন তার ম্যানিফেস্টো লেখা -

কাব্যাংশ-৩
আগামীকাল খুব সহজ, কিন্তু আজ কিছু ধরাবাঁধা নয়,
নির্জন, ঐ জমিটার মতই কুঁড়ে, যে পার্সপেকটিভের সূত্রগুলো
দেখিয়ে দিতে কেবল কুঁড়েমি করে ;
চিত্রকরের গভীর অবিশ্বাস এখান থেকেই শুরু হল, যদিও
ওটা একটা দুর্বল যন্ত্রমাত্র। হ্যাঁ, কিছু জিনিষ তো ঘটবেই,
সে জানে, কিন্তু ঠিক কোনগুলো সে জানে না। একদিন

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

আমরা অনেক কিছু করার চেষ্টা করবো এবং কিছু একটা
হয়তো করেও ফেলবো, যদিও আজ যে সব আশ্বাস দেওয়া হল
তার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

কাল অনেক দূর। আয়নার সবচেয়ে কাছে আজ। এই মুহূর্ত। সেটাই বড় হয়ে ধরা পড়ে। তাই কঠিন মনে হয় এই আজকের মুহূর্তটাকেই। আজকের প্রচেষ্টার মধ্যেই আমাদের যাবতীয় কাজ ও ক্লেশ। আজকের কাজের মধ্যেই সম্ভাবনা। কিন্তু ঠিক কোথায় সম্ভাবনা ? কিসের সম্ভাবনা ? অনিশ্চয়তার মেঘ দ্রুত ছড়িয়ে যায়। যে অনিশ্চয়তা ভিন্ন জন অ্যাশবেরীকে বোঝার চেষ্টা করাও উচিৎ নয়। যে অনিশ্চয়তা, ভিন্নতা ও স্ববিরোধ ছাড়া ভাবা উচিৎ না একালকে। আবার একথাও আমার মনে হয়েছে যে অনিশ্চয়তা সম্ভাবনার বিনাশ ঘটায় মাত্র। অনিশ্চয়তা নয় ; অ্যাশবেরীর কবিতা আমাদের বিবিধ সম্ভাবনার হদিশ দেয় কেবল। জীবনযাপনের আশেপাশে যে অন্য আরো কত যাপনচিত্র ছিল, আরো অন্য কতরকমেরই যে হয়ে উঠতে পারতো আমাদের জীবন ও অভিজ্ঞতা, সেটাই বুঝিয়ে দেয়। প্রকৃতি ও মহাবিশ্বের ব্যাখ্যায় বিজ্ঞান যে সম্ভাব্যতার তত্ত্ব (probabilistic theory ) নির্মাণ করেছে আধুনিককালে, অ্যাশবেরীর কবিতাভাবনা যেন তাকেই প্রবলভাবে সমর্থন করে।
ভাসারির মনে হয়েছিল যে পারমিয়াজিয়ানিনোর চেহারাটি যেন দেবদূতের মত। এ প্রসঙ্গে অ্যাশবেরী লিখছেন -

কাব্যাংশ-৪
‘ হয়তো দেবদূতকে দেখতে অনেকটা আমাদের বিস্মৃতির মত
যা যা আমরা ভুলে গিয়েছি, যা আর চেনা লাগেনা
চোখের সামনে এলেও, যাদের সম্বন্ধে আর কিছুই বলতে পারিনা আমরা
অথচ একদা তারা আমাদেরই ছিল।’

অল্প পরে এক জায়গায় লেখেন -

কাব্যাংশ-৫

‘ছবিটা প্রায় শেষ, চমকটা প্রায় ফুরিয়ে আসছে, যেমন বাইরে
তাকিয়ে তুমি হঠাৎ লক্ষ্য করলে বরফ পড়েছে কতক্ষণ ধরে
এখন, বরফের থেমে আসার মধ্যেও ইলশেগুঁড়ির বরফকণারা।
তুমি ঘুমিয়েছিলে, যখন বরফ পড়া শুরু হয়। আর এর জন্য
জেগে বসে থাকারও কোন মানে ছিল না, অবশ্য দিনটা শেষ হয়ে আসছে
এবং এখন কিন্তু তোমার আর চট করে ঘুম আসবে না, আসতে
ঢের দেরী।’

সাধারণ কথ্য ভাষায় এমনকিছু কথা বলা হলো যা আমাদের মনে কোনই দাগ না কেটে চলে যাবে হয়তো। কিন্তু আগের কথা ভাবতে হয়। পরে কবি আর কি কি বলতে পারেন তার কথাও। এতক্ষণে হয়তো অ্যাশবেরীর কবিতাপদ্ধতি বা তার নকশা সম্বন্ধে আমাদের একটা আবছা ধারণা তৈরি হয়েছে। সেই আলোয় আবার ওপরের অংশটা পড়ে আমার মনে হল প্রক্রিয়ার মধ্যে যে একটা নিরন্তর স্বভাব রয়েছে, একটা অনিঃশেষ রয়েছে এটা মনে করা দরকার। সব শেষ, একটি সূচনার প্রথম ধাপ। বরফ পড়া বন্ধ হলেই জেগে থাকার শুরু। ছবি শেষ হলেই তাকে নিয়ে ভাবনার শুরু। এটাই ধারাবাহিকতা।

কাব্যাংশ-৬
‘কিন্তু এক নতুন আসছে, টের পাও, হাওয়ায় এক দুর্মূল্য নতুন।
তাকে সহ্য করতে পারবে তো ফ্রান্সেস্কো ? ততটা জোর তোমার আছে তো ?
হাওয়া ভাসিয়ে নিয়ে আসে কাকে সে জানে না, সে স্বচালিত, অন্ধ
নিজের সম্বন্ধে অবোধ। একটা জাঢ্য যা পড়তে না পড়তেই
গোটা কর্মকান্ডকেই (সে গোপনই হোক বা ঢ্যাড়া পেটানো) সমর্থন করে।
শব্দের ফিসফিস যা ঠিক বোঝা যায় না
কিন্তু অনুভব করা যায়, এক শৈত্যপ্রবাহ যা বাইরের দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে
তোমার স্নায়ুর পেনিন্সুলা ধরে, উত্তমাশা অন্তরীপ ধরে

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

ক্রমশ এক আর্কিপেলাগোতে, এক সমুদ্রের সুস্নাত খোলা গোপনতায়।'

সত্য খোলা। জীবন খোলা। সুন্দর খোলা, সমুদ্রের মত। কোন আড়াল নেই কোথাও। কিন্তু তাও সব ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এক দুর্মূল্য নতুন আসছে, অথচ সে নিজেকেও বোঝে না। এখানেই অ্যাশবেরীর পশ্চিমী সমালোচক 'অনিশ্চয়তা'র চিহ্ন দেখতে পান। আমি পাই সম্ভাবনা, তার চেয়ে বেশী সম্ভাব্যতার কথা। যা হল, তার মতনই বাস্তব যা হতে পারতো। অনিশ্চয়তা আনন্দ আনে না, ক্রমশ দুশ্চিন্তার দিকে ঠেলে দিতে থাকে আমাদের। ভবিতব্য সম্বন্ধে নানা সংশয় ও ভয় আমাদের মনে জমতে থাকে অনিশ্চয়তার কথায়। সম্ভাবনা আশার দিকে চেয়ে থাকে, আনন্দের খোঁজ করে, জীবনকে জোর দিতে থাকে। আবার এটাও ঠিক, অনেক সম্ভাবনার থেকেই অনিশ্চয়তার জন্ম।

নাগরদোলায় একটা মুখ ক্রমাগত ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে একসময়ে তাকে অন্য মুখ মনে হয়। অন্যান্য নানা মুখের আদল যেন তার ওপর এসে পড়লো। মুখটা বদলে গেল যেন। ইঙ্গমার বার্গম্যানের 'পারসোনা' ছবির কথা মনে পড়লো, যেখানে লিভ উলমানের মুখের একদিক এসে ঢেকে দেয় বিবি অ্যান্ডারসনের মুখ। দর্শক সেই নতুন মুখটা চিনেও চিনতে পারেন না। আজ ডিভিডির কল্যানে ছবিকে থামিয়ে দেখে তবে বোঝা যায়। অ্যাশবেরীর কবিতার স্বাক্ষরটাই তাই। সত্যকে এক ঝলক দেখিয়ে আবার তাকে খন্ডন করা। একেকসময়ে মনে হয় তাকে যেন সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অতীত ও ঐতিহ্য-অচেতন মার্কিণ সংস্কৃতিকেই যেন শুনিয়ে লেখেন -

কাব্যাংশ-৭

আজকের রন্ধ্রে রয়েছে যেন আজকেরই এক বিশেষ সচলতা
রোদে পড়ে পাওয়া, তার অটুট প্রত্যয় থেকে ঐ দুটো ডালের ছায়া
ফুটপাথে ফেলা। অতীতের কোন একদিনও আজকের মত নয়।
আমি ভাবতাম তারা সবাই এক
ভাবতাম বর্তমান সবার কাছে একইরকম।

এই দ্রুত পটপরিবর্তন, অথচ মূল ভাবনার মুখটির কাছাকাছি থেকে যাওয়া, অনেক দূরকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে আবার ফিরে আসা, ফিরে এসে দেখা ও দেখানো যে মূল ভাবনাটি যতটা মূল, ততটাই 'ভুল'। এই দার্শনিক অস্বচ্ছতা, যা ইচ্ছাকৃত, সহজাত, স্বাভাবিক জন অ্যাশবেরীকে সম্ভবত এই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির অলিখিত শিরোপা দিয়েছে। ১৯৭৭ সালে 'উত্তল আয়নায় আত্মপ্রতিকৃতি' কবিতায় জন লিখছেন -

কাব্যাংশ-৮

কানে কানে ছড়িয়ে দেওয়া কথাটি
সারা ঘর ঘুরে এসে কত অন্য অর্থের হল।
এই তত্ত্বই শিল্পকে পরিচালিত করে
বদল করে শিল্পী যা চেয়েছিল তার চেয়ে।
একেকসময় তার মনে হয় সে যেটা দেখাতে শুরু করেছিল
সেটাই বাদ পড়ে গেছে কখন।

এই অংশটা প'ড়ে চমকে যাই। চীন দেশে একটা পুরনো খেলা আছে যা অবিকল এরকম। একজন একটি গল্প কানে কানে বলে দেন তার পাশের জনকে। তিনি আবার তার প্রতিবেশীকে। এইভাবে গল্প রচয়িতার কাছে যখন তার গল্পটি কানাকানি করে ফিরে আসে তখন সে বিচার করতে বসে কতটা বদলেছে তার মূল কাহিনী। এই চৈনিক উপকথার নামেই, প্রায় বিশ বছর পর জন অ্যাশবেরীর ১৯৯৮ সালের কাব্যগ্রন্থ Chinese Whispers । জনকে একথা লিখে জানাতে উত্তর আসে - 'ঠিক। আমারও খেয়াল নেই। তুমিই প্রথম এটা আমায় ধরালে। আসলে খুব অল্প বয়সেই এই চৈনিক খেলাটার কথা শুনি। তখন থেকেই মাথায় ছিল। এমনকি ১৯৭৭ এও।' ঝাক দেরীদার শেষ জীবনের একটা সাক্ষাৎকারের কথা মনে পড়ে যেখানে শিল্পরসের আপেক্ষিকতা প্রসঙ্গে দেরীদা বলছেন - ' ধরুন, একটা গ্রুপফটো তোলা হচ্ছে। ছবিতে আপনি আছেন। ছবি তোলার সময় আপনার মনে হলো আপনি নিখুঁতভাবে নিজের মুখটাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। অথচ যখন ছবি প্রিন্ট হয়ে এলো আপনি হতাশ হলেন। ভাবলেন - ইশ্ ! আমাকে কি এরকম দেখতে ? কি বদলে গেলো তাহলে ? যে ছবি তুললো, সে কি আপনাকে অন্যভাবে দেখতে চাইলো ? নাকি আপনি নিজেকে যেমন দেখতে চেয়েছিলেন অন্যেরা সেভাবে দেখতে পেলনা ?' জন অ্যাশবেরীর কবিতার প্রেমে পড়ে গেলে বারংবার এই প্রশ্নগুলির মুখোমুখি হতে হয়।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com